শ্রীহট্টের একটা টুকরো ভারতের সীমানাভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের পাঁচটি মহকুমা যথাক্রমে শ্রীহট্টসদর, মৌলবীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জের মধ্যে করিমগঞ্জের বদরপুর, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ও করিমগঞ্জ থানার অর্ধেক ভারতের অংশ রূপে চিহ্নিত হয় এবং অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার 'আয়তন সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ'[১]।

সুতরাং শাসকীয় চক্রান্তের শিকার হয়েই বাংলা ভাষাভাষী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন অসমের অন্তর্গত হয়ে রইল, সেইসঙ্গে অবশ্য অন্যান্য কারণেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলা ভাষাভাষী বহু মানুষকে অসমে এসে বসবাস করতে দেখা যায়। যেমন ১৮৩৮ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন অসমের প্রশাসনিক ও শৈক্ষিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার বাধ্যতামূলক ব্যবহার চালু করেছিল। তার ফলে সেসময় স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতের কাজকর্ম পরিচালনার সূত্রে বহু বাঙালির আগমন হয় অসমে। তাঁদের অনেকেরই সন্তান-সন্ততি ভাষিক পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেও দীর্ঘকাল ধরে অসমের স্থায়ী বাসিন্দা। তাছাড়া ৪৭-এর দেশভাগ, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পূর্ববাংলার টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে বহু উদ্বাস্তু সীমান্ত পেরিয়ে অসমে এসে ঘর বেঁধেছিল।

বর্তমান সময়ে অসমে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা জরুরি। প্রথমত বহুবিচিত্র উৎস থেকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অসমে এসেছিলেন বলে এখানকার বাংলা ভাষায় কোনো একটি নির্দিষ্ট উপভাষার পরিবর্তে একাধিক উপভাষার পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। কখনও কখনও একধরনের মিশ্র ঔপভাষিক ব্যবহারও দেখা যায়। দ্বিতীয়ত বরাক উপত্যকায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের রক্ষাকবচ খাতায় কলমে থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মান্য করা হয় না, বা বরাক উপত্যকা বাদ দিলে সামগ্রিক বিচারে সরকারি কাজকর্ম, শিক্ষাক্ষেত্র, আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসমিয়া ভাষার ব্যবহারিক প্রাধান্য থাকায় বাংলা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সীমিত। ফলে স্বভাবতই বাংলা ভাষা সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত এবং অন্যতম রাজ্যভাষা ও সরকারি ভাষার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অসমিয়াভাষার 'অপর' রূপে বিবেচিত। বিশেষত লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, সভাসমিতি, সংবাদপত্রে যে মান্য চলিত বাংলা অসমে ব্যবহৃত হয় তা দুভাবে প্রান্তিকায়িত। তার একদিকে ঘরে বলা উপভাষার টান অন্যদিকে বাইরে চলা অসমিয়া ভাষার প্রভাব। অন্যভাবে বলা যায় যে একজন শিক্ষিত বাঙালিকে ঘরে ব্যবহৃত উপভাষা ও সমাজে ব্যবহৃত অসমিয়া ভাষার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মান্য বাংলায় কথাবলা যা লেখালেখির কাজ করতে হয়। সুতরাং অসমের বাঙালির ন্যূনতমভাবে ত্রিভাষিক অবস্থান। উপভাষার ঘরোয়া ব্যবহার বাদ দিলে অসমের দ্বিভাষিক বাঙালির বাংলা ভাষায় অসমিয়া ভাষার যে প্রভাব তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

বিভিন্ন আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে দুই বা ততোধিক পৃথক ভাষাভাষী মানুষের দীর্ঘকাল সহাবস্থান ও পারস্পরিক সংযোগের ফলে সাধারণত সেই ভাষাগোষ্ঠীর বক্তারা একাধিক ভাষার কার্যকরী ও ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বাভাবিক

দক্ষতা অর্জন করে। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই একযোগে একজন বক্তার একাধিক ভাষা বলতে পারার এই সক্ষমতা ও প্রবণতাকেই বহুভাষিকতা (Multilingualism) রূপে চিহ্নিত করা হয়। অসমে বসবাস করা বাঙালিদের মধ্যে যেমন মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমিয়া ভাষা ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে ওঠে এবং বাংলা অসমিয়া ভাষার যুগপৎ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ফলেই অসমবাসী বাঙালিদের দ্বিভাষিক (Bilingual) ভাষাবৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলা যায়।

দ্বিভাষিক বক্তারা দুটি ভাষাই শেখে সাধারণত পারিবারিক ও পারিবেশিক কথোপকথনের সূত্রে, কোনো শিক্ষাগত শৃঙ্খলা বা প্রথাগত ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে নয়। 'For example, someone born of English-speaking parents in Germany, who learn the one language from his family and the other from his playmates, possesses two idiolects rather than one.'[২] সাধারণত দুটো ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রও তাদের কাছে পৃথক থাকে। 'Sometimes two more languages are used in fairly sharply differentiated situations, for example, one at home, and one for more formal contacts with others at work and in public.'[৩] সুতরাং দুটি ভাষার সামাজিক মর্যাদা, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে দ্বিভাষিক বক্তা একদিকে যেমন দুটি ভাষা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে তেমনি দুটি ভাষাতন্ত্রেরই পারস্পরিক অভিঘাত বক্তার মনের উপর সতত সক্রিয় থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দ্বিভাষিকতার সঙ্গে জড়িত থাকে তিনটি বিষয়।

প্রথম দ্বিভাষিকতায় সংশ্লিষ্ট ভাষাদুটির সামাজিক স্বীকৃতির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে ভাষাদুটির যদি অবস্থানগত হেরফের হয় তবে সেই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসও বিচার্য। সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুটি ভাষার ভাষিক মর্যাদার প্রসঙ্গটি প্রধানত সমাজভাষাতত্ত্ব বা Sociolinguistics-এর পরিধিভুক্ত। এক্ষেত্রে বাংলা ও অসমিয়া ভাষার সামাজিক মর্যাদার তুলনামূলক পর্যালোচনা জরুরি। দ্বিতীয়ত ঘরের ভাষা আর বাইরের ভাষা সম্পর্কে দ্বিভাষিক বক্তার মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। মূলত গোষ্ঠী ও পরিবারের অভ্যন্তরে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাববিনিময়ে ব্যবহৃত ঘরের ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকে একটা আবেগময়তা আর বাইরের জগতের কাজকর্মের ভাষাটির পিছনে থাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। দ্বিভাষিক বক্তার ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কিত মনোভাবের আলোচনা মূলত মনস্তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব বা Psycholinguistics-এর আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে বাংলা ও অসমিয়া ভাষা সম্পর্কে অসমের দ্বিভাষিক বাঙালির মনোভাব আলোচ্য। তৃতীয়ত, দুটি পৃথক ভাষার ক্রমাগত ব্যবহার এবং একটি ভাষিক পরিকাঠামো থেকে অন্য একটি ভাষিক পরিকাঠামোয় বারংবার যাতায়াতের ফলে দ্বিভাষিক বক্তার মাতৃভাষার কাঠামোটি সংক্রামিত হয়। দুটি ভাষাতন্ত্রের সহাবস্থানের ফলে দ্বিভাষিক বক্তার নিজস্ব ভাষায় যে অবয়বগত পরিবর্তন দেখা যায় তাই ভাষাতত্ত্ব বা Linguistics-এর মূল বিচার্য। অসমের দ্বিভাষিক বাঙালির বাংলা ভাষায় অসমিয়া ভাষার প্রভাব নির্ণয় এক্ষেত্রে উপজীব্য।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে Assam Code-এর বাংলা অনুবাদের ঠিক পরেই ইংরেজ শাসক অসমের বিদ্যালয়, আদালত ও সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিল। ফলে রাজনৈতিক কারণে সেসময় অসমে বাংলা ভাষার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অসমিয়া মানুষের ভাষার অধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতনতার অভাবেই নিতান্ত প্রতিরোধহীন ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের এই শাসননীতি। বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেবার এই শাসকীয় সিদ্ধান্ত যে অসমিয়াভাষী বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল সে কথা ডঃ মহেশ্বর নেওগ উল্লেখ করেছেন 'অসমিয়া প্রজার সেসময় বুদ্ধিই ছিল না নাকি কথা বলতে পারার শক্তিই ছিল না, সরকারের আদেশ নির্বিরোধে চলল জগন্নাথের রথের মত ঘর্ঘর করে।[৪] যাইহোক জীবিকার সুবিধা বা ইংরেজ প্রভুর সন্তুষ্টি ইত্যাদি কারণে অসমিয়াদের মধ্যেও বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয় একশ্রেণির অসমিয়া যুবক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে বাংলা ভাষা ব্যবহারে গৌরব বোধ করতেন তা গুণাভিরামের পরবর্তীকালের খেদোক্তি থেকে অনুমান করা যায়—'যুবকদের কথা কী বলব, অনেক সজ্জন ব্যক্তিও বাংলা যাত্রাই ভাল বলে শোনে ও আয়োজন করে। কেউ কেউ এও বলে যে, 'অসমিয়া কি একটা ভাষা নাকি? তা শিখলে আমার কী হবে? অসমিয়া কথা, ভাষা, রীতি, ধর্ম, আচার, ব্যবহার সবকিছু খারাপ, কেবল বাঙালিরাই ভাল?'[৫] বাংলা ভাষার সেই আভিজাত্য সেসময় ছিল বলেই ১৮২৯-এ হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন তাঁর 'আসাম বুরঞ্জি' বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায় আর্থ-রাজনৈতিক কারণে অসমে একসময় বাংলা ভাষার সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি অসমিয়া ভাষার চেয়ে বেশি ছিল। তারপর ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিশেষত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া ও মিশনারি ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতায় অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে জোরালো দাবি ওঠে। মোটামুটি ভাবে ১৮৫০ পরবর্তী সময় থেকে অসমিয়া ভাষার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত যৌথ উদ্যোগের পরিণামে ১৮৭৪-এ অসমিয়া ভাষা পুনরায় শাসকের স্বীকৃতি লাভ করে এবং শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিতে অসমিয়া ভাষা ও অসমিয়া ভাষীর আধিপত্যের ফলে স্বভাবতই খর্ব হয়েছে বাংলা ভাষার কতৃত্ব। এমনকি এর চরম পরিণতি হিসেবে ভাষিক বৈষম্যের শিকারও হতে হয়েছে বাংলা ভাষাকে। ১৯৬০ সালে 'এক দেশ এক ভাষা'-র নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে যে আন্দোলনের সূচনা হয় বা তার পরবর্তী কালে ৭২-এর মাধ্যম আন্দোলন প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল বাংলা ভাষা। আর ভাষা যেহেতু অবয়বহীন একটা বিমূর্ত বিষয় সেহেতু ভাষাবিরোধের মূল লক্ষ্য হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট ভাষায় কথা বলা মানুষেরা। ফলে ভাষিক পরিচিতিই বাঙালির অস্তিত্বের সংকটের কারণ হয়ে ওঠে। মোটকথা সমাজভাষা তত্ত্বের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়—একসময়ে শিক্ষা, প্রশাসন ও অন্যান্য জীবিকায় বাঙালির উচ্চপদে অবস্থান ও বাংলা ভাষার রাজনৈতিক স্বীকৃতি থাকায় বাংলা ভাষার যে সামাজিক গুরুত্ব ছিল স্বাভাবিক নিয়মেই তা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে অবশেষে সংখ্যালঘু ভাষার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার সামাজিক মান্যতা পরিবর্তনের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে অসমের দ্বিভাষিক বাঙালির ভাষা মানসিকতা। অবশ্য সেই ভাষাবোধ যেমন অনড়, অপরিবর্তনীয়, কোনো মনোভাব নয়, তেমনই তা একপেশে, একমাত্রিকও নয়। বরং খুব স্বাভাবিক কারণেই এই ভাষাভাবনা বহুবিচিত্র টানাপোড়েনের এক মিশ্র বিশ্বাসবোধের অভিব্যক্তি। পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি প্রধান প্রতিক্রিয়া রূপে যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপট 'ঊর্ধ্বতন পক্ষ সব সময় চায় অধস্তনকে চাপের মধ্যে রেখে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে আনুগত্য আদায় করতে। চায় অধস্তন ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে মিশে যাক, নিজের আত্মপরিচয় ভুলে যাক। এই চাওয়া থেকেই ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পোষাক ইত্যাদি জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। অধস্তন ক্ষমতাহীন, অসহায় কিন্তু আত্মসচেতন হওয়াতে নীরবে অন্যভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নিজের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, সাংস্কৃতিক গর্ববোধকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে ঊর্ধ্বতনের যাবতীয় মোটিফগুলোকে তাচ্ছিল্য বা অস্বীকার করতে শুরু করে।'[৬] আপনার বলে আঁকড়ে ধরার প্রধান উপাদান ভাষা। মাতৃভূমি হারিয়ে আত্মপরিচয়ের শেষ সম্বল হয় মাতৃভাষা। সেই ভাষাকে যেকোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার মূল্যবোধ থেকেই জন্ম নেয় এক ধরনের প্রতিরোধী ভাবনা। ক্রমশ আধিপত্যবিস্তারী অসমিয়া ভাষার আগ্রাসী মনোভাব মূল্যবোধ থেকেই জন্ম নেয় এক ধরনের প্রতিরোধী ভাবনা। ক্রমশ আধিপত্যবিস্তারী অসমিয়া ভাষার আগ্রাসী মনোভাব ও জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে সতত সক্রিয় থাকে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য ইচ্ছায় সাহিত্য রচিত হয়, সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আবার আরোপিত শর্তের বিপক্ষে ভাষার অধিকার রক্ষায় আন্দোলন করে, প্রাণ দেয়। ১৯৬১-র ১৯শে মে শিলচরের ভাষা শহিদদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রতিরোধী চেতনায় পরোক্ষ প্রভাব ফেলে অতীত বৃত্তান্তের স্মৃতিসুখ, উচ্চমন্যতার শ্লাঘা ও উন্নাসিকের তাচ্ছিল্য। ফলে সব মিলিয়ে ভাষা হয়ে পড়ে আত্মর বিকল্প, আত্মরক্ষার প্রতিকল্প হয় ভাষার সুরক্ষা। অত্যন্ত সন্তর্পণে ভাষাকে রক্ষা করার এই চেষ্টাকেই বলা যায় প্রতিরক্ষামূলক প্রবণতা (Protective Attitude) দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিত 'কিন্তু বাধ্যতা যেটুকু অঙ্গীকার দাবি করে, ভাষা অধিগত করা তার চেয়ে অধিক মনোযোগ পায়—যদি আকর্ষণ এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বিহারের রাজ্যভাষা, সরকারি ভাষা, কার্যালয়ের ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম এবং সর্বস্তরে এর জনগোষ্ঠীর ভাষা হিন্দী ক্রমে বাংলা ভাষিক শ্রেণীর কাছে 'মান্য ভাষা' বা Prestigious language বলে গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবহারিক বিচারে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে আসা প্রথম ভাষাটি (এক্ষেত্রে বাংলা) বরং অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট বলেই মনে হতে থেকেছে ক্রমশ। বাধ্যতামূলক ও প্রয়োজনীয় হিন্দী-ইংরেজির সঙ্গে অনাবশ্যক আর একটি ভাষা, তা হলই বা মাতৃভাষা, তাকে অনায়াসে ছাড়ান দেওয়া চলে। তাতে প্রেস্টিজের হানি নেই।'[৭] শ্রীমতী ঘোষ বিহারের দ্বিভাষিক বাঙালি প্রসঙ্গে যে মতামত দিয়েছেন তা অসমের কিয়দংশ বাঙালির ক্ষেত্রেও সত্যি। জীবিকা, অর্থোপার্জন বা প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে অসমিয় ভাষা ব্যবহারে যদি কিছু বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষিক পরিচয় লুকিয়ে রাখাই

বাঞ্ছনীয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একাত্মতায় বিরুদ্ধ স্রোত এড়িয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে থাকাও সহজ নয়। আর তাই পরভাষাকে নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করার কৃতিত্ব অর্জন করে অসমের দ্বিভাষিক বাঙালি। এই মনোভাবেরই একটি বহিঃপ্রকাশ হল যখন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্ররা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক বিষয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসেবে মূল স্রোতে মিশে যাবার মোহ, নিখুঁতভাবে অন্য ভাষাটিকে আয়ত্ত করার অহং—এই সব মিলেমিশে থাকে আত্মভাষাটিকে পর করার চিন্তায়। প্রধানত ব্যক্তিস্বার্থে পারবশ্য স্বীকারের এই মনোভাবের পিছনে অলক্ষে কাজ করে আরও যেসব মনোবেদনা তার মধ্যে উল্লেখ্য যথাক্রমে—কর্তৃত্বহীনতার বেদনা, ক্ষমতাহীনের ব্যর্থতা, সম্মানহানির ক্ষোভ, হীনমন্যতার গ্লানি ও অত্যাচারিতের ভীতি। সমস্ত হেনস্থা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হয় এই স্বীকরণ। একে বলা যেতে পারে প্রয়োগবাদী মানসিকতা (Pragmatic Mentality)।

অসমিয়া ও বাংলা দুটো ভাষাতন্ত্রের প্রতিনিয়ত ব্যবহার এবং একটি তন্ত্র থেকে অন্য তন্ত্রে বারংবার অবস্থান পরিবর্তনের এই দ্বিভাষিক লক্ষণ প্রধানত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের মধ্যেই দেখা যায় বলে তাঁদের ভাষিক অভ্যাসই মূলত সমীক্ষার অন্তর্গত। ভাষাতাত্ত্বিকদের মত অনুযায়ী 'There were all the possibilities of diffusion in area where the languages of different stocks were spoken. As soon as people began to become bilinguals considerable linguistic overlaping started.'[৮] সুতরাং দুটি ভাষার মধ্যেই পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্ভাবনা থাকে যদিও তথাপি বিশেষত বাংলা ভাষায় অসমিয়া ভাষিক উপাদান অনুপ্রবেশের তথ্য বিশ্লেষণের জন্যই এক্ষেত্রে উপাত্ত (Data) সংগৃহীত হয়েছে। প্রথমেই দেখা যাক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলে একটি বিচ্যুতিই যে আদর্শ হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ। মান্য চলিত বাংলায় 'ভাল'-র সঙ্গে 'বাস' বা 'লাগ' ধাতুরূপ জুড়ে 'ভাললাগা' বা 'ভালবাসা' এই সংযোগমূলক ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়। কিন্তু অসমবাসী বাঙালিরা 'ভালবাসা' বা 'ভাললাগা' অর্থ 'ভাল'-র সঙ্গে 'পা' ধাতুরূপটি জুড়ে 'ভাল পাওয়া' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করে। মান্য চলিত বাংলার 'ভাললাগা'-র সাপেক্ষে 'ভাল পাওয়া' বিচ্যুতি হলেও অসমের বাংলা ভাষায় সর্বজনীন ব্যবহারে তা আদর্শ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গটি চমৎকার ভাবে একটি গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে—'ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বইটার ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল। ত্রিদিব কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল এক দিকে ডটপেন দিয়ে লেখা, 'সান্ত্বনা খুব সান্ত মেয়ে/এমনটি আর কোথাও নাই,/তাই তো আমি সবার চেয়ে/সান্ত্বনাকে ভালপাই।' ... যে লিখেছে তার বাড়ি অসমে। আমাদের 'ভালবাসি' ওদের 'ভালপাই'। টুকরোটা আবার বইয়ের ভিতর ঢুকিয়ে রাখল সে।'[৯] এখন অসমের বাংলা ভাষায় 'ভাল'-র সঙ্গে 'পাওয়া' ক্রিয়াপদের সংযোগ সম্পূর্ণত অসমিয়া ভাষায় 'ভাল পোয়া'-র বিপরীতে ব্যবহৃত 'বেয়া পোয়া'-র সাদৃশ্যে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষায় 'খারাপ পাওয়া' শব্দযুগলের সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবহারও সার্বিক মান্যতা পেয়েছে। মান্য বাংলায় 'কিছু মনে না করার অর্থে 'খারাপ পাওয়া' অসমের দ্বিভাত্তিক বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অসমের দ্বিভাত্তিক বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষত বক্তার অজ্ঞাতসারে যখন অসমিয়া ভাষিক উপাদান তাঁর বাংলা ভাষার কাঠামোটিকে সংক্রামিত করে তখন তাকে অনিচ্ছাকৃত প্রয়োগের উদাহরণ রূপেই গণ্য করা উচিত। অবশ্য সাহিত্য রচনায় লেখক কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবেও দুটি ভাষার মিশ্র প্রয়োগ করেন। প্রধানত পরীক্ষার খাতা ও দৈনিক সংবাদপত্র থেকে অনিচ্ছাকৃত প্রয়োগ এবং গল্প-কবিতা থেকে ইচ্ছাকৃত প্রয়োগের উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে এই প্রভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

অতঃপর প্রথমে পরীক্ষার খাতা থেকে সংক্রমণের উদাহরণগুলি তুলে ধরা যাক—

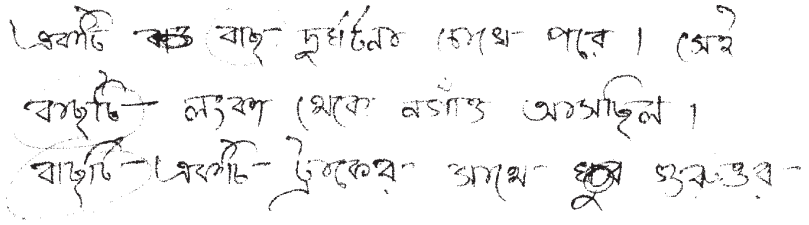

Bus শব্দটির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে দন্ত্য-স (Dental-S) ব্যবহৃত হয়। অসমিয়া ভাষায় দন্ত্য-স বর্ণের উচ্চারিত রূপ পৃথক। আর দন্ত্যমূলীয় উষ্মধ্বনির (Alveolar Fricative) বর্ণচিহ্ন রূপে 'চ', 'ছ' ব্যবহৃত হয়। ফলে অসমিয়া প্রভাবে 'বাস' শব্দটি 'বাছ' রূপে লেখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঙালির অনেকসময়ই 'বাস' শব্দটি 'বাছ' রূপে উচ্চারণ করে অর্থাৎ 'ছ' বর্ণচিহ্নের তালব্যধ্বনিসুলভ উচ্চারণ বজায় রাখে। এটিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাবের উদাহরণ বলা যেতে পারে।

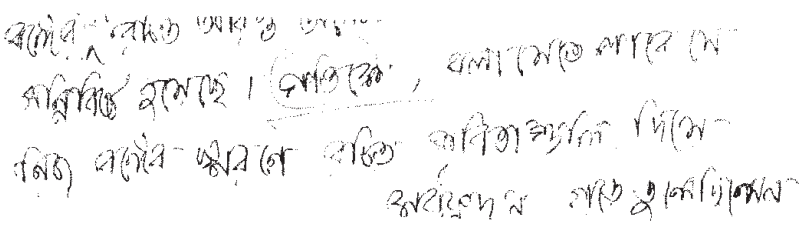

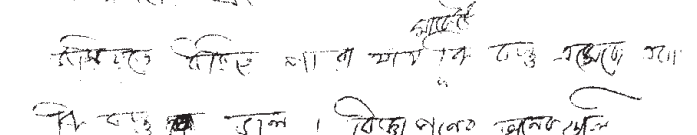

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণে দেখা যায় 'মাধ্যমে' ও 'ফলত' অর্থে দুটি অসমিয়া শব্দ 'জরিয়তে' ও 'গতিকে' সম্পূর্ণ অবিকৃত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই শব্দদুটি বাংলা শব্দের পরিবর্ত (Substitute) রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিকল্প ব্যবহার আসলে শব্দ খুঁজে না পাওয়া (Loss of vocabulary)-র উদাহরণ।

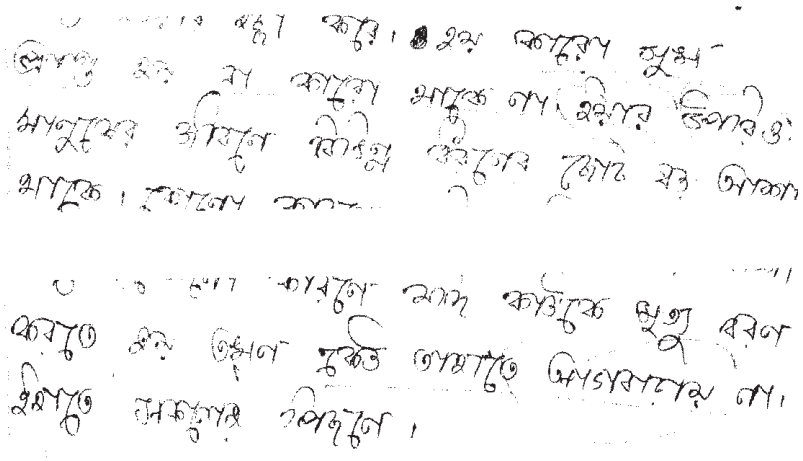

চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণে ব্যবহৃত 'ইয়ার উপরিও' ও 'আগবাড়ায়' শব্দদুটি যথাক্রমে বাংলা উপরন্তু এবং এগোনো ও বাড়ানো শব্দগুলির সঙ্গে ধ্বনিসাম্যযুক্ত। অর্থাৎ এখানে কাছাকাছি অর্থের সাদৃশ্যযুক্ত অসমিয়া শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুতরাং এটিকে সাদৃশ্যমূলক প্রভাব (Analogical influence)-এর উদাহরণ বলা যেতে পারে।

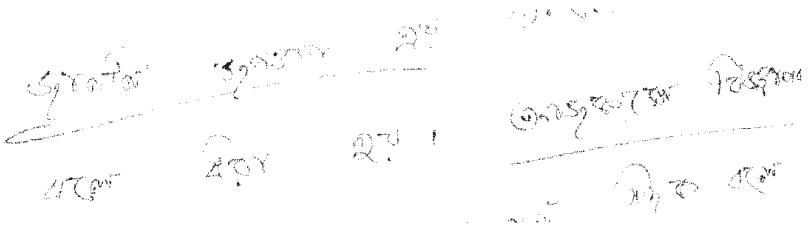

ষষ্ঠ উদাহরণটিতে দেখা যায় 'বিজ্ঞপ্তির' বিকল্প শব্দরূপে অসমিয়া 'জাননি' শব্দটি তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ারূপ 'জনাওয়া' সহ সামগ্রিক (Comprehensive) ভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'জাননি' শব্দের আকর্ষণে যেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত 'জনাওয়া' শব্দটিও ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং এটিকে পারস্পরিক সম্পর্কিত শব্দযুগ্মক (Associative counterpart)-এর ব্যবহার রূপে চিহ্নিত করা যায়।

সংবাদ লহরি

গুয়াহাটি ৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ শনিবার ২১ নভেম্বর ২০০৯

অনেকেরই পথের সংসার। ফুটপাথে ইট বসিয়ে দিব্যি রান্না চলছে। আমুলের টিনের টেমায় ফুটছে ভাত; আসলে ভাত নয়, স্বপ্ন। খিদে জুড়নোর স্বপ্ন। লবণ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আয়েশ করে খাওয়া যাবে। যদি

সংবাদ লহরি

গুয়াহাটি ১৯ আশ্বিন ১৪১৬ মঙ্গলবার ৬ অক্টোবর ২০০৯

জিন্দাবাজারে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের প্রতিবাদ সভায় প্রায় এক হাজার শ্রমিক অংশ নেন। শ্রমিকরা গোটখাই আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য সিদ্দিক আলি ও সভাপতি আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে

সংবাদ লহরি

গুয়াহাটি ২১ আশ্বিন ১৪১৬ বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর ২০০৯

ঠিকাদাররা পালিয়ে যান। এরপর উপস্থিত আধিকারিকদের সামনেই ক্ষুব্ধ জনতা নালা ভেঙে দেয়। ঠিকাদাররা নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমন-কি মিস্ত্রিও জোগালিদের প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। অন্যদিকে, রানি কপিলি সেচ প্রকল্পে প্রায় এক ডজন প্রকল্পাশ্রয়ী

দৈনিক যুগশঙ্খ

নব পর্যায়ে বর্ষ : ১৯, সংখ্যা ১৭৮, ২২ আশ্বিন, গুয়াহাটি, শুক্রবার, ৯ অক্টোবর ,২০০৯

সিং ধোনির। জরিমানার পরিমাণ মাত্র ১০০ টাকা। রাঁচির পরিবহন নিগমের এক কর্মকর্তা এখবর জানিয়ে বলেন, দেরি করেও ধোনি রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করেছেন বুধবার। নিয়ম অনুযায়ী নতুন গাড়ি কেনার সপ্তাহ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে হয়। অবশ্য ধোনি আবেদন করেছিলেন কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ ছিল। প্রাথমিকভাবে জরিমানার পর যদি তাঁকে আবার বিনা রেজিস্ট্রেশনে নতুন গাড়িটি চালাতে পাওয়া যায়,

সংবাদপত্রেও বাংলা 'কৌটো' শব্দের পরিবর্তে 'টেমা'; 'জমায়েত হওয়া' শব্দের পরিবর্তে 'গোটাখাই' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা 'জোগাড়ে' শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত 'জোগালি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি অসমিয়া বাক্যাংশের অনুকরণও দেখা যায়। যেমন অসমিয় 'হপ্তা দিনর মাজত' অনুসরণে 'সপ্তাহ দিনের মধ্যে' ব্যবহৃত হয়েছে মান্য বাংলার 'এক সপ্তাহের মধ্যে' বোঝাতে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা গল্পকাররা গল্পের প্রয়োজনে কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবেই এই দ্বিভাষিক বাচন বৈশিষ্ট্যকে তাঁদের গল্পে স্থান দিয়েছেন। কাহিনির বাস্তবধর্মিতাকে পরিস্ফুট করা বা চরিত্রের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্বাসযোগ্যতাকে তুলে ধরার জন্য লেখকরা কাহিনি বর্ণনায় বা সংলাপে অসমিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন।

উদাহরণ হিসেবে দীপংকর করের 'শত্রু শত্রু খেলা' গল্পে দেখা যায় নারায়ণের একান্ত নিজস্ব ভাবনার প্রকাশে লেখক লেখেন—"নারায়ণ ভাবে, সেও তো এখানকারই লোক। গতিকে থলুয়া নয়তো কী? ঘনকান্তদের সঙ্গেই তো হাতে-পায়ে-পাছায় মাটি ঘষটাতে ঘষটাতে তার বড় হওয়া। কিন্তু সময় যে এখন বড় গণ্ডগুলিয়া।"[১০] অথবা 'উদ্ধারপর্ব' গল্পে কানাইয়ের মন্তব্য— "... 'কাহা' (কাকা), গলা উঁচিয়ে বলে কানাই, 'পেহারে (পেপারে) কী লেখছে দেক্‌ছ। সরকারে কয় ছাড়তাম না, হেরাও কয় ছাড়তাম না। মাঝখানেতে রাইজরে বলির খাসি বানাও।'..."[১১] অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা 'রবি রচনাবলী ঃ ৭৮৩ সংখ্যক কবিতা'-তেও দেখা যায়—

"রবিবার কেবলে হিট সিনেমা দেয়। কারণ রবিবার
ছুটির দিন। অটো এবং টেকারের এবং টেকারের

পিছনে ঝুলা পোয়ালিগুলার কোনো রবিবার নাই।
..... রবিবারে ইসকুল বন্ধ থাকে।
গতিকে আমি পিয়াংকারে এবং পিয়াংকায় আমারে
ফোন করতে পারে না, রবিবার আমি একদম ভাল পাইনা।"[১২]

দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলের বাঙালি লেখকেরা বাংলা হরফে অসমিয়া শব্দ লেখেন এবং শব্দগুলির বাংলা অর্থ পৃথকভাবে পাঠকদের জন্য বরাদ্দ করেন না।

অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের দ্বিভাষিকতা সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। সাধারণত তিন ধরনের দ্বিভাষিকতা এখানে দেখা যায়। প্রথমতঃ যুগপৎ দ্বিভাষিক (Simalteneous Bilingual) অর্থাৎ যাঁরা দুটো ভাষাই সমান দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারেন। প্রধানত শিশুবয়স থেকেই যাঁরা দুটো ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন তাঁরাই যুগপৎ দ্বিভাষিক হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণক্ষম দ্বিভাষিক (Receptive Bilingual) যাঁরা দুটো ভাষাই ভাল করে বুঝতে পারেন কিন্তু বলতে পারেন একটাই। সাধারণত বয়স্ক মানুষেরা যাঁরা বেশি বয়সে অসমে এসেছেন এখন বৃদ্ধ, তাঁরা অসমিয়া ভাষা বুঝতে পারলেও বলতে পারেন না। তৃতীয়তঃ অনুক্রমিক দ্বিভাষিকতা (Sequential Bilingual) যাঁরা প্রথম ভাষা হিসেবে একটি ভাষা শেখার পরে দ্বিভাষিক হন। সাধারণত মধ্য বয়সে চাকুরিসূত্রে যে বাঙালিরা অসমে এসেছেন তাঁরা কাজের প্রয়োজনে অসমিয়া শিখে যে দ্বিভাষিক হয়েছেন।

সাধারণত এই তৃতীয় ধরনের দ্বিভাষিক বক্তারাই ভাষিক মিশ্রণের জন্য বিশেষত দায়ী। সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় অসমে বসবাসকারী বাঙালির দ্বিভাষিকতার কিছু লক্ষণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু উদাহরণসহ আলোচিত হল। প্রধানত দুটি ভাষার পারস্পরিক অবস্থান এবং কর্মোপলক্ষে অসমিয়া ভাষা শেখাই দ্বিভাষিকতার প্রধান কারণ। যদিও বাংলা স্কুলে অসমিয়া শিক্ষক নিয়োগ বা বাংলা পাঠ্যপুস্তকে অসমিয়া শব্দের প্রয়োগও বর্তমানে এই দ্বিভাষিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য, 'বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুনির্মল দত্ত, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পা.) *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, পৃ.-৭৯, শিলং ১৯৯৬।

২। Hockett Charls F., *A Course in Modern Linguistics*, p-321, New Delhi, 1970.

৩। Robins R. H. *General Linguistics*, p-402, London 1989.

৪। ড. মহেশ্বর নেওগ, *অরুণোদই ১৮৪৬-১৮৫৪*, পৃ.-৮৬, অসম প্রকাশন পরিষদ, ১৯৮৩।

৫। গুণাভিরাম বরুয়া, অরুণোদই ১৮৪৬-১৮৫৪, পৃ-১২২৮-২৯, অসম প্রকাশন পরিষদ, ১৯৮৩।

৬। মানিক দাস, 'আমন্ত্রিত সম্পাদকীয়', প্রশান্ত চক্রবর্তী, কান্ডারভূষণ নন্দী (সম্পা.) *ফিনিক্স-অবিরত যাত্রা*, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৮, গুয়াহাটি, ২০০৬।

৭। মঞ্জুলী ঘোষ, 'বিহারের দ্বিভাষিক বাঙালী ও বাংলা ভাষা', *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, পৃ.-২০, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮৩।

৮। Trivedi G. M., *Socio-Linguistic Study in an Andhra Village*, p-53, Calcutta, 1983.

৯। অশোক সেন, 'সান্ত্বনা খুব 'সান্ত মেয়ে', *দেশ পাক্ষিক*, ৭৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, পৃ.-৬৭, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯।

১০। দীপংকর কর, *খোলশকথা*, পৃ.-৫৩, গুয়াহাটি, ২০০২।

১১। দীপংকর কর, *খোলশকথা*, পৃ.-৬৩, গুয়াহাটি, ২০০২।

১২। অভিজিৎ চক্রবর্তী, *মানাস দর্পণ পত্রিকা*, সেপ্টেম্বর, পৃ.-১২, বরপেটা রোড, ২০০৬।

Sanjay Dey, Department of Bengali, Noagaon College, Assam
drnzoy@gmail.com

শ্রী অরবিন্দের চিন্তাধারায় সমকালীন প্রসঙ্গ

এন. এইচ. এম. আবু বকর

[*কথা মুখ : ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য নয়, এই জগতে মানব জীবনটাকে কেমন করে সত্যসুন্দর করে গড়ে তোলা যায় এই ছিল শ্রী অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) স্বপ্ন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সীমাবদ্ধ মনের সীমানা পার হয়ে বর্তমানের অসমর্থ মানুষ সাধনা ও ত্যাগের মাধ্যমে একদিন অতিমানস স্তরে পৌঁছে জগতে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করবে। এইভাবে সাধনার মাধ্যমে মানব প্রকৃতি রূপান্তরিত হলে মানুষের সমাজ, প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলীও রূপান্তরিত হবে এবং এই জগতে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হবে। যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসকে একজন মানুষ অন্য একজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবে—স্বার্থদ্বন্দ্ব ও অহংকারের পরিবর্তে গভীর মমতায় যে কোনো অন্যায় বা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সবাই এক সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আজীবন এই লক্ষ্যেই শ্রী অরবিন্দ সাধনা করে গিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল তাঁর এই চিন্তাধারায় সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা।*]

শ্রী অরবিন্দ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দুর্লভ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক অনন্য দার্শনিক। সুদীর্ঘ ৭৮ বৎসর বয়সের কর্মময় জীবনে তিনি একাধারে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, মরমী সাধক, আধ্যাত্মিক গুরু, রাজীনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, যোগী, বিবর্তনবাদী দার্শনিক, সাংবাদিক ও কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।[১] পরাধীন ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার মানসে ১৮৯৩-১৯১০ পর্যন্ত প্রথম সারির একজন জাতীয় নেতা হিসেবে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[২] পরবর্তীতে, তাঁর ভাষায় আন্তর-নির্দেশে, রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে মানব অস্তিত্বের অন্তরদর্শী পারমার্থিক সাধনায় নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। সমন্বিত যোগ বা অতিমানস দর্শনের বিকাশ তাঁর এই সাধনারই ফল।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় জনগণের প্রতি শ্রী অরবিন্দের দায়বদ্ধতা ছিল ভিন্ন। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে জনগণকে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[৩] এক্ষেত্রে ১৮৯৩-১৮৯৪—এই দুই বৎসর 'ইন্দু প্রকাশ (Indu Prakash)' নামক একটি ইংরেজি পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাবলী[৪] বিশেষ ভূমিকা রাখে। দেশের স্বাধীনতার জন্য বাইরের কোনো শক্তির

আবু বকর, এন. এইচ. এম. :শ্রী অরবিন্দের চিন্তাধারায় সমকালীন প্রসঙ্গ
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 195-202